বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

জীবনানন্দ দাশ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব’সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি- চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম- বট- কাঁঠালের- হিজলের অশথের ক’রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে!
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল- বট- তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল : বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে-
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়-
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল- একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

লেখক পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯, বরিশাল - ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪, কলকাতা) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাংলা কবি। তাঁকে বাংলা ভাষার শুদ্ধতম কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে তিনি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিল তত দিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম কবিতে পরিণত হয়েছেন। তিনি প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তবে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে অকাল মৃত্যুর আগে তিনি নিভৃতে ১৪টি উপন্যাস এবং ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছেন যার একটিও তিনি জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। তাঁর জীবন কেটেছে চরম দারিদ্রের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকাল অনপনেয় ভাবে বাংলা কবিতায় তাঁর প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্র পরবর্তী কালে তিনি বাংলা ভাষার প্রধান কবি হিসাবে সর্বসাধারণ্যে স্বীকৃত

সাহিত্যিক জীবন

সম্ভবত মা কুসুমকুমারী দাশের প্রভাবেই ছেলেবেলায় পদ্য লিখতে শুরু করেন তিনি। ১৯১৯ সালে তাঁর লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। কবিতাটির নাম বর্ষা আবাহন। এটি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার ১৩২৬ সনের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে লিখতেন। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি জীবনানন্দ দাশ নামে লিখতে শুরু করেন। ১৬ জুন ১৯২৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের লোকান্তর হলে তিনি 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন যা বঙ্গবাণী পত্রিকার ১৩৩২ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে দীনেশরঞ্জন দাস সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকায় ১৩৩২ (১৯২৬ খ্রি) ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁর নীলিমা শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হলে আধুনিক বাংলা কবিতার

ভুবনে তার অন্নপ্রাশন হয়। জীবদ্দশায় তাঁর ৭টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত ঝরাপালক শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রকৃত কবিত্বশক্তি ফুটে ওঠেনি, বরং এতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকট প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়। তবে দ্রুত তিনি স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্য সংকলন ধূসর পান্ডুলিপি-তে তাঁর স্বকীয় কাব্য কৌশল পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ভুবনে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। শেষের দিককার কবিতায় অর্থ নির্মলতার অভাব ছিল। সাতটি তারার তিমির প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে দুবোর্ধ্যতার অভিযোগ ওঠে। নিজ কবিতার অবমূল্যায়ন নিয়ে জীবনানন্দ খুব ভাবিত ছিলেন। তিনি নিজেই স্বীয় রচনার অর্থায়ন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন যদিও শেষাবধি তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে কবি নিজেই নিজ রচনার কড়া সমালোচক ছিলেন। তাই সাড়ে আট শত কবিতার বেশি কবিতা লিখলেও তিনি জীবদ্দশায় মাত্র ২৬২টি কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও কাব্য সংকলনে প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন। এমনকী রূপসী বাংলার সম্পূর্ণ প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি তোরঙ্গে মজুদ থাকলেও তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি জীবনানন্দ দাশ। তবে তিনি এ কাব্যগ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন বাংলার ত্রস্ত নীলিমা যা তাঁর মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত এবং রূপসী বাংলা প্রচ্ছদনামে প্রকাশিত হয়। আরেকটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় মৃত্যু পরবর্তীকালে যা বেলা অবেলা কালবেলা নামে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশায় তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল কবি। অর্থের প্রয়োজনে তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন ও প্রকাশ করেছিলেন। তবে নিভৃতে গল্প এবং উপন্যাস লিখেছিলেন প্রচুর যার একটিও প্রকাশের ব্যবস্থা নেননি। এ ছাড়া ষাট- পঁয়ষট্টির বেশি খাতায় 'লিটেরারি নোটস' লিখেছিলেন যা আজও প্রকাশ হয়ে চলেছে।

বিশ্লেষণ

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতার তালিকায় আধুনিকেরা কোন্ কবিতাগুলি অন্তর্ভূক্ত করেন? হয়তো 'বোধ', হয়তো 'আট বছর আগের একদিন', হয়তো 'বনলতা সেন'। এ-রকমটাই হবার কথা। কারণ আধুনিকদের রয়েছে আধুনিক মন। কাজী নজরুলের কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ নিজেই লিখেছেন, 'অর্থগভীরতায় এসব কবিতা আধুনিক কালের প্রাজ্ঞ আত্মজিজ্ঞাসু মনকে ক্বচিৎ তৃপ্ত করে।' আমরা যারা আধুনিকতাবাদী, যারা নিজেদের করে তুলেছি প্রাজ্ঞ ও আত্মজিজ্ঞাসু, তাদের জন্যে চাই অর্থগভীর কবিতা। এই যখন পরিস্থিতি, তখন খুবই সংকোচের সঙ্গে আজকের আলোচনার জন্য এমন একটা কবিতা বেছে নিচ্ছি, যে কবিতা ও যার সঙ্গী অন্য কবিতাগুলো কবি রচনা করেছিলেন ২৩ বছর পর, ১৯৫৭-য় ততোদিনে কবির তিরোধানেরও ৩ বছর হয়ে গেছে। কবি জীবনানন্দ দাশ তার জীবদ্দশায় 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করেন নি।

কেন করেন নি! হয়তো বরিশালের এই সংঘলাজুক, অবগুণ্ঠিত, মিতবাক মানুষটি কলকাতার আধুনিক কবিতার উত্তুঙ্গ আন্দোলনের মুখে এই কবিতাগুলির প্রকাশকে সঙ্গত বলে মনে করেন নি। ধূসর পান্ডুলিপি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু তাকে চিহ্নিত করেছিলেন 'প্রকৃতির কবি' বলে। হয়তো রূপসী বাংলা বেরুলে তার কপালে জুটতো পল্লীকবির অভিধা! কেমন ছিল ওই সময়টা?

আমরা যে মধুসূদনকে বলি প্রথম আধুনিক কবি, বঙ্কিমচন্দ্রকে বলি উপন্যাসের জনক, তার মূলে তো এই যে তাঁরা নিয়েছিলেন প্রচুরভাবে, কখনো-বা সরাসরি, পশ্চিম থেকে, ইউরোপ থেকে, ঔপনিবেশিকদের কাছ

থেকে। মডার্নিজম বলতে যে ঐতিহাসিক আধুনিকতার আন্দোলন, বোদলেয়ার বা এলিয়ট যে আধুনিকতাবাদের পুরোধা ও টিপিকাল উদাহরণ, মধুসূদন তো- সে-অর্থে মডার্নিস্ট নন।

জীবনানন্দ দাশের সময়টা বোঝানোর জন্যে তাঁরই প্রবন্ধ থেকে খানিকটা উদ্ধার করতে পারি:

মধুসূদন যেমন বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী--রবীন্দ্র--বঙ্কিমও তাঁদের কাছে অল্পাধিক গিয়েছিলেন--বর্তমান কবিদের অল্পবিস্তর পরষ্পর নিঃসক্ত বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী তেমনি বোদলেয়ার ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে ইয়েটস, এলিয়ট ও পাউন্ড-এর কাছে গেলে খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে বলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালি কবির তেমন মন যোগাত না; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভেরলেন, রসাঁর, ইয়েটস ও এলিয়ট-এর সাদর্থক বা নঙর্থক মননবিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতার কথা)

জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, তাঁরা, বুদ্ধদেব বসুরা, পশ্চিম আধুনিকাদের কাছে গেছেন অভিনবত্বের খোঁজে ও সহমর্মিতা বোধ থেকে, কিন্তু ওই অভিনবত্বের খোঁজটা হঠাৎ জরুরি হয়ে পড়লো কেন? হৃদয় কেন ওই আধুনিকদের সঙ্গে সমধর্মিতা অন্বেষণ করতে শুরু করলো?

ব্রিটিশরা এই ভারতে উপনিবেশ না-গাড়লে, প্রায় পোনে দুশ বছরের উপনিবেশিতের ঘোর না-থাকলে ব্যাপারটা কী ঘটতো বলা মুশকিল। তবে পশ্চিমে যে আধুনিকতা, যার লক্ষণ বলে আবু সয়ীদ আয়ুব চিহ্নিত করেছেন অমঙ্গলবোধ, বুদ্ধদেব বসু, চিহ্নিত করেছেন কৃত্রিমতার আরাধনা, (কী সাংঘাতিক উক্তি, নারী স্বাভাবিক বলেই ঘৃণ্য), আর শহরসর্বস্বতা, যেখানে বৃক্ষের জায়গায় থাকবে আলোকস্তম্ভ, এইসব, এই আধুনিকতা, এই বিবমিষা, এই বিচ্ছিন্নতা, এ-সবই পুঁজিবাদী নগর জীবনের ক্লান্তির ফসল। যেমন, পুঁজির বিকাশের কালে ব্যক্তির উদ্ভবের পর্বে পশ্চিম গেয়ে উঠেছিল রোমান্টিকতার জয়গান। অর্থাৎ বলতে চাইছি, কোনো সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ইজম গড়ে ওঠে-- যদি তা নেহাতই হুজুগ না হয়-- সমাজব্যবস্থার ভেতর থেকে, তার উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে। পশ্চিমে তা-ই ঘটেছিল, আধুনিকতাবাদও পশ্চিমী সমাজের ভেতরের ব্যাপার, যার বীজ পশ্চিমী সভ্যতার রক্তে, যার চিহ্ন প্রস্ফুটিত তার চামড়ার গায়ে--ভাবরাজ্যে।

এখন বাঙলা ভাষার এক কবি, যাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা বরিশালে--বরিশাল: দু' ধার উপচানো নদী, দুই তীরে সবুজ আর সবুজ, আর পাখি--যিনি পড়েছেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে, অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন বলে কলকাতায় এসেছেন; এবং অধ্যাপনার কাজে ফিরে গেছেন আবার বরিশালে, তার পক্ষে কি রাতারাতি সম্ভব নাগরিকজীবনে অভ্যস্ত, ক্লান্ত, বিচ্ছিন্ন এবং অতঃপর আধুনিক হয়ে ওঠা? চটজলদি, রাতারাতি! ১৯৩৪-এই! সম্ভব, নাকি সঙ্গত!

আজ ভাবতে বিস্ময় জাগে, কতো বড়ো কবিত্বের এবং কবিত্বের অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তিনি যে, ওই সব ডামাডোলের মধ্যে থেকেও নিজস্বতাকেই কেবল প্রকাশ করে গেছেন তিনি, লিখেছেন বাঙলা মহত্তম কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা' , কিন্তু লাজুক লোকটা চিৎকার করে বলে যান নি যে দেখো, আমি লিখে গেছি আমাদের কবিতা, আমার কবিতা! গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলো তার মৃত্যুরও তিন বছর পর!

কিন্তু সমকাল তার সম্পর্কে ছিল আশ্চর্যরকম নীরব। বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ চিনেছিলেন যে, এই হলো কবি, কিন্তু ঠিক ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেন নি তাঁকে। সমকাল তার সম্পর্কে যে বরফশৈত্য দেখিয়েছে, তার সাক্ষ্য:

আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই প্রধান ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আলোচনা সাহিত্যিক অসাহিত্যিক সব মহলেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মফস্বলবাসী এবং স্বভাবতই নিঃসঙ্গ বলেই তাঁর এই বদনসিব

কিনা জানি না; মনে হয় আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান গতিপথ থেকে তাঁর অসংকুচিত নিঃশব্দ পলায়নই এ অবহেলার মূলে। (আবুল হোসেন, চতুরঙ্গ)

'বাংলার মুখ আমি' কাবিতাটি ১৪ পংক্তির, অষ্টক-ষষ্ঠকে বিভক্ত, অর্থাৎ সনেট-আকৃতির। সনেট ব্যাপারটাও পশ্চিমের, বলতে দ্বিধা কী!

বাঙলার মুখ তিনি দেখেছেন, পৃথিবীর রূপ আর দরকার নেই তার দেখার!

ঘোষণা!

না। পরের লাইন এই-প্রায়-ঘোষণাকে নিয়ে যায় কবিতার পাতালে, কবিতার প্রদোষে, যেখানে অন্ধকার মিশছে আলোর সঙ্গে, লোকটা জেগে উঠেছে অন্ধকারে, চোখ আরাম পাচ্ছে, অন্ধকারের আরাম, তারপর ডুমুরের গাছ, ছবি পিছলে যাচ্ছে, ছাতার মতন বড়ো পাতা, তার নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েলপাখি। এই কবিতা, মন দিয়ে যেই পড়বে, সে যেখানেই থাকুক, ঘরে কিংবা ট্রেনে, মর্ত্যে কিংবা চাঁদে, ভোরের দোয়েল পাখি তার দু' চোখকে, তার অন্তরকে দেবে স্নিগ্ধতার স্পর্শ, তারপর তার সমস্ত স্মৃতি ও সত্তা জুড়ে বেজে উঠবে ঘোর গৃহটান, নস্টালজিয়া, জাম, বট, কাঁঠাল, হিজল, অশ্বত্থের পাতার স্তূপ, নীরবতা, ফণিমনসার বনে পাতার ছায়া।

কিন্তু এও বাহ্য। অষ্টকে শেষ পংক্তিটা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! চাঁদ সওদাগরও একদিন এই সব দৃশ্য-উপাদান নিসর্গশোভার ভেতরে ছিল। চম্পা নামে নগরীতে।

(কোথায় এই সমতট, কেই-বা চন্দ্রশেখর?.....'উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে পাহাড়, মধ্যে সমতলকে দ্বিখন্ডিত ক ' রে গভীর খাড়ি-সমেত নদী যার নাম চম্পাবতী, তার তীরে উপনিবেশের নগর চম্পক বা চম্পা।' চাঁদবেনে/ অমিয়ভূষণ মজুমদার)

বরিশালের জীবনানন্দ দাশ, এবার আমাদের নিয়ে গেছেন লোকপুরাণে, মনসামঙ্গলে, বরিশালের এক কবির লেখা একটা 'মনসামঙ্গল' আছে, বা না-থাকলেও ক্ষতি ছিল না, পূর্ববাংলার এ হলো নিজস্ব কাব্য, লোকমুখে প্রচলিত ও জীবন্ত। ইংরেজির অধ্যাপক, আধুনিক-আন্দোলনের এক কর্মী মিথের জন্যে পশ্চিমে হাত পাতলেন না, এমন কি নিলেন না আর্যপুরাণ থেকেও, নিলেন একেবারে ঘরের জিনিসটি, যা হয়তো ছিলো দাদির কাঁথা-বোনা সুতোয়, হয়তো বা কোনো জীর্ণ পুঁথিতে।

কিংবা পুরাণ থেকে নিলেই তো সবটা হয়ে গেলো না! নিয়ে বুনলেন-টা কী! এবার আমরা অনুভব করতে চাইছি বাংলা কবিতার এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গাঙুড়ের জলে ভেলা ভাসিয়ে একদিন বেহুলা চলেছিল, সঙ্গে মৃত স্বামী শয়ান, কৃষ্ণ দ্বাদশীর জ্যোৎস্না তখন নদীর চড়ায় পড়ে আছে মৃত, আর বেহুলা দেখেছিল সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট, শুনেছিল শ্যামার নরম গান!

হ্যাঁ শুনেছিল। আমাদের অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন তো এই ভিটায়, আজ তারা নেই, সেই শূন্যতা আমাদের বুকে বাজে বৈকি!

বেহুলা গিয়েছিল ইন্দ্রের নগরে, মৃত স্বামীকে বাঁচাবে বলে, আর ওই যে মহাদেব, তাকে এখন খুশি করতে হবে, তার চিত্ত জয় করতে হবে, এ-যে কী উভয় সংকট, বাংলার সাধারণ নারীটি এই স্বর্গসভায় এসেছে নিজের স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে নিতে, আর দেখো, তাকে করতে হচ্ছে অন্যের মনোরঞ্জন, আর দেখো সে নাচছে, মনোরঞ্জন করছে পুরুষদের, তার হৃদয়ের অবস্থাটা তখন কী রকম?

'...ছিন্ন খঞ্জনার মতো।'

বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ উপমাটি জীবনানন্দ দাশ লিখে ফেললেন--ছিন্ন খঞ্জনার মতো বেহুলা নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়।

আসুন পাঠক, মস্তক ছিঁড়ে-ফেলা এক খঞ্জনার নাচ, তার রক্তপাত, তার শারীরিক ও মানসিক বেদনা, তার নীরব ভাষাহীন চিৎকার অনুভব করি। বেদনায়, অপমানে, হতমানে আমাদের হৃদয় মনসার ছোবল-খাওয়া শরীরের মতোই নীল হয়ে ওঠে নাকি!

মোঃ রায়হান খান
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: raihankhancs@gmail.com